ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 752- 758
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.286

মনোজ মিত্রের সামাজিক নাটক

ড. সুপ্রিয়া দাস, *সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রামঠাকুর মহাবিদ্যালয়, ত্রিপুরা, ভারত*
ড. অরুপা চক্রবর্তী, *পি জি ফ্যাকাল্টি, বাংলা বিভাগ, মহারাজা বীর বিক্রম মহাবিদ্যালয়, ত্রিপুরা, ভারত*

Received: 06.03.2026; Accepted: 14.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In the field of modern Bengali drama, Manoj Mitra's contribution deserves special recognition. He has also achieved distinction in writing social dramas. His play Chak Bhanga Madhu is a notable social drama. In this play, he presents a realistic picture of the exploitation carried out by the landlord and moneylender classes in rural society, as well as the helpless suffering of poor common people. Aghor Ghosh symbolizes the oppressive class in the drama, who mercilessly exploits the villagers through the power of wealth and authority. On the other hand, Martala and her daughter Badami represent the oppressed section of society. Hunger, poverty, and humiliation devastate their lives.

Keywords: Poverty, Humanism, Moral Responsibility, Rural Social Structure, Socio-economic Context, Rebellion and Revenge, Mass Struggle, Social Injustice, Forgiveness and Resistance

বাংলা নাট্য-সাহিত্যে একজন প্রখ্যাত নাট্যকার হলেন শ্রী মনোজ মিত্র। নাট্য-জগতে শ্রী মনোজ মিত্রের নাম নাট্যকার, অভিনেতা ও পরিচালক এই ত্রিবিধ মাত্রার গুণে অন্বিত। তৎসত্ত্বেও এই তিনটির মধ্যে নাট্যকার মনোজ মিত্রের অবদান সর্বাধিক, একথা তর্কাতীত। পাঠকের সঙ্গে নাটকের, বিশেষ করে বাংলা নাটকের দূরত্বটা কখনো কখনো বড় অসহনীয় ঠেকে। নাটক যেন বন্দী হয়ে আছে থিয়েটারে, নাটক যেন হয়ে আছে গৃহবন্দী। তার ভালো-মন্দ বিচার চলে কেবলই মঞ্চনিরিখে। নাটকের গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান মেলে প্রযোজক-পরিচালক-নটনাটক দর্শকদের তরফ থেকে।

বাংলা নাটক আর একালের পাঠকদের মাঝখানের ভাঙা সেতুর পুনর্নির্মাণের কাজটি করেছেন নাট্যকার মনোজ মিত্র। সমগ্র নাট্যজীবনে মনোজ মিত্র চেষ্টা করেছেন মানুষের মন থেকে মুছে যাওয়া মূল্যবোধের রক্ষণ ও তার লালনের। নাটকের বিষয়ভিত্তিক শ্রেণীকরণের অন্যতম একটি শ্রেণী হল 'সামাজিক নাটক'। নাটক যেহেতু মানুষের জীবনের কথা বলে এবং মানুষমাত্রেই সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ, সেহেতু বৃহত্তর অর্থে যে কোনো নাটকই সামাজিক নাটক। বিশিষ্ট সমালোচক কুন্তল চট্টোপাধ্যায় সামাজিক নাটকের সংজ্ঞা দিয়েছেন এইভাবে:

> "সামাজিক নাটক বলতে আমরা বুঝি কোনো একটি যুগ বা সময়ের সামাজিক সমস্যা ও সঙ্কট নিয়ে লেখা নাটক। সমাজের অন্তর্গত শক্তি সমূহের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব কিংবা সমাজের সঙ্গে ব্যক্তি-মানুষের দ্বন্দ্ব এ জাতীয় নাটকের উপজীব্য।"[১]

নাট্যকারের সমকালের সামাজিক সমস্যা সামাজিক নাটকে গুরুত্ব পেয়ে থাকে। বিশেষ সামাজিক পরিস্থিতিতে ব্যক্তিচরিত্রের সমস্যাও সামাজিক নাটকে চিত্রিত থাকতে পারে। এই শ্রেণীর নাটকে নাট্যকার কখনো সমস্যা সমাধানের পথের ইঙ্গিত দেন, কখনো বা সমাধানের পথ খোঁজার দায়িত্ব অর্পণ করেন পাঠক-দর্শকদের ওপর। নাটকের ভরকেন্দ্রে একটি বিশেষ সামাজিক সমস্যা থাকলে তাকে বলা হয় সামাজিক সমস্যামূলক নাটক। পাশ্চাত্য সমালোচনা সাহিত্যে এই শ্রেণীর নাটককে বলা হয়েছে Problem Play, ব্রিটিশ কবি তথা নাট্যকার Marjorie Boulton এই শ্রেণীর নাটক সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন:

> "It is usually somewhat tragic in tone in that it naturally deals with painful human dilemmas; it is the kind of play that, by implication, asks a definite question and eithersupplies an answer or leaves it to us to find one."[২]

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে পাশ্চাত্য নাট্যসাহিত্যে এই ধরনের নাটকের আবির্ভাব ঘটে। বার্নার্ড শ-এর 'Mrs. Warner's Profession', 'Major Barbara', গোর্কির 'The Lower Depths', গলসওয়ার্দি-এর 'Justice' এবং ইবসেনের 'Pillars of Society' ইত্যাদি নাটক এই শ্রেণীর নাটকের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

নাটক রচনা এবং অভিনয় সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে নাট্যকার মনোজ মিত্র বলেছেন যে, তিনি মানসিক ও জাগতিক সত্যের ভিত্তিতে অভিনয় নামক সর্বজনপ্রিয় এবং আশ্চর্য রহস্যময় শিল্পকলার বাস্তবতার সন্ধান করেছেন। তিনি অনুসন্ধান করে পেতে চেয়েছেন অভিনয়ের এবং নাটক রচনার ঠিক-বেঠিক, ভালো-মন্দ-সুন্দরের হদিশ। এই অনুসন্ধানের তীব্র আকর্ষণেই হয়তো নাট্যকার মনোজ মিত্রের এই উক্তি:

> "সাত-আট বছর বয়সেই মোটামুটি ধরে ফেলেছিলাম, লেখাপড়া হচ্ছে না। তার জন্যে দুঃখ ছিল না। মোটামুটি ঠিক করে রেখেছিলাম বড় হয়ে কী হব। জেলে হয়ে মাছ ধরব। তাঁতি হয়ে তাঁত চালাব। স্যাকরা হয়ে গয়না গড়ব। কুমোর হয়ে মাটর হাঁড়ি গড়ব। রাখাল হয়ে গোরু চালাব। ফকির হয়েও গাজনপীরের গান গাইতে পারি।"[৩]

মনোজ মিত্রের মতে, অভিনয়কলা বিষয়ে চিরকালই লোকের কৌতুহল। আজ তরুণ প্রজন্মের কাছে অভিনয় একটি চিত্তাকর্ষক পেশাও বটে। এই কথা মাথায় রেখেই তিনি নাটক ও অভিনয়ের জগতে নিজেকে সমর্পিত করেছেন। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় যুক্ত থাকার সময় ছাত্রছাত্রীরা মনোজ মিত্রকে মন-নির্ভর আন্তরিক অভিনয় বিষয়ে জানতে চাইলে এবং নাটক রচনার বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা জানতে চাইলে তিনি বলেন:

> "আমার প্রথম নাটক ('মৃত্যুর চোখে জল', ১৯৫৯) রচনার সময়কাল তথা জীবনের প্রথম অভিনয়ের দিনটি ছিল সত্যিই ভয়ঙ্কর।"[৪]

নাটক রচনার ক্ষেত্রে মানবমনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ বা মনোসমীক্ষণ নাট্যকার মনোজ মিত্রের ছিল না। তিনি শুধুমাত্র চেয়েছিলেন মানসিক এবং জাগতিক সত্যের ভিত্তিতে অভিনয় নামক শিল্পটিকে বুঝে নিতে। তাঁর মতে, নাটক রচনা তথা অভিনয়ের জন্যে দরকার মনকে জানার নয়, মনকে বোঝার। তিনি নাটক বলতে কেবলমাত্র অভিনয়কেই রেখেছেন; থিয়েটার, সিনেমা, যাত্রা- সব মাধ্যমেরই অভিনয়।

নাট্যকারের কথায়, আমাদের কৃষিনির্ভর ভূখন্ডের লোকনাট্যগুলোর দিকে তাকালে বোঝা যাবে যে, নাট্যের জন্মবৃদ্ধি ঘটেছে মৃত্তিকার গুণগান গেয়ে, শস্য-ফসল-বনসম্পদের বন্দনার মধ্যে দিয়ে। নাটকের চরিত্রের সঙ্গে একীভূত হওয়ার এই যে প্রয়াস, তজ্জনিত উন্মাদনা এবং পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন- এর মূলে আছে বোধ হয় বহির্বিশ্বের শিল্পীদের মৃত্তিকার প্রতি আসক্তি। এদেশের শিল্পীদের গহিন অন্তর্লোকে এবং নিজ্ঞান মানসলোকে সক্রিয় আছে এক আদিম ভৌমটান। মনোজ মিত্রের কথায়, ভূমির চেতনা নাট্যকারের প্রতিভাকে নানা আভরণে বিভূষিত করে। তাঁকে দেয় উপলব্ধির গাঢ়তা, অনুভূতির সূক্ষ্মতা, তন্ময়তা, আবেগ-প্রক্ষোভের অগ্নিময়তা, কল্পনার গতিশীলতা, মায়ামমতা, সহানুভূতিশীলতা- এইরকম আরও অনেক কিছুর সঙ্গে জীবন-জীবিকার স্বপক্ষে ইতিবাচকতা। বুদ্ধি দিয়ে কাটাছেঁড়া না করে, শিল্পী ভাবাবেগে চরিত্রটাকে কাছে টেনে নেয়, হয়ে উঠতে চায় তার মতো।

মৃত্তিকার টান নাটক রচনার ক্ষেত্রে নাট্যকার মনোজ মিত্রকে দিয়েছে প্রগাঢ় আসক্তি, প্রবলতার কল্পনাশক্তি। তাই তিনি কখনও ক্লান্ত বা অধৈর্য হননি, এবং হবেন না- এটাই হল মূল কথা। আর যেহেতু গাছের দুটো কদম ফুল বা দুট জ্যোৎস্নারাত্রি কোনোদিন একরকম হলেও দুটি মানুষ কখনও একরকম হবে না- তাই মানসনির্ভর থিয়েটার এবং নাট্যকারের রচনাও কখনো পুনরাবৃত্তির দোষে দুষ্ট হবে না, পুরনোও হবে না, ফুরোবেও না।

মনোজ মিত্রের নাট্যসৃজন পটভূমি:

'সুন্দরম' নাট্যসংস্থার জন্য ১৯৫৯ সালে মনোজ মিত্র যখন তাঁর 'মৃত্যুর চোখে জল' প্রথম নাটকটি লিখলেন, গণনাট্যের পথ বেয়ে নবনাট্যের আবির্ভাবের পরও তখন কেটে গেছে অনেকটা সময়কাল। নাট্যজগতে তখন দুই প্রবল ব্যক্তিত্বের টানাপোড়েন- শম্ভু মিত্র এবং উৎপল দত্ত। এঁদের একজনের কাজে অনুভূতির প্রাধান্য, অপরজনের কাজে বক্তব্যের। এই দুই ধারাকে নিজের নাটকে মেলালেন নাট্যকার মনোজ মিত্র। তাঁর নাটক রচনার আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটটিকে চমৎকারভাবে চিহ্নিত করেছেন কুমার রায় মহাশয়। সমাজ-রাজনীতির নিপুণ পর্যবেক্ষণ এবং উপস্থাপন আছে মনোজ মিত্রের নাটকে। বিশেষ সামাজিক অবস্থায় পতিত মানুষের সমস্যা এবং সেই সমস্যা থেকে উত্তরণের ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি, তবে তা কোন রাজনৈতিক তত্ত্বের অনুগামী হয়ে নয়। কারণ মনোজ গণনাট্য সংঘ বা অন্য কোনও রাজনৈতিক দলের সাংস্কৃতিক সংগঠনের উত্তরাধিকার দাবী করেন নি কখনো। বরং তিনি এসব থেকে নিজেকে অসম্পৃক্ত রাখতে চেয়েছেন।

স্বাধীনতাকে কেন্দ্র করে যে স্বপ্ন মানুষ দেখেছিল তা তখন ক্রমশ ভেঙে যাচ্ছে। আধুনিক ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানুষের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠছে নিঃসঙ্গতাবোধ, আশ্রয়হীনতার সমস্যা। নিজের কালের সেই সমস্যা মনোজ মিত্রের নাটকে বিষয় হিসেবে গৃহীত হয়েছে। ক্রমাগত প্রতিবাদ আর শত্রু সংহার করতে গিয়ে বাংলা নাটক যখন রূপের দিক থেকে ক্রমশ দীন হয়ে পড়ছে, তখন তিনি বাংলা নাটকে নিয়ে এলেন 'আলো ছায়ায় ঘেরা গভীর গোপন মানুষ, অন্তর্লোকের বাসিন্দা মানুষ'-কে। তাঁর প্রায় প্রত্যেক নাটকেরই কেন্দ্রে আছে একজন অসহায় গড় মানুষ।

সে মানুষ কখনো পরিবার, কখনো সমাজ, কখনো বা রাজনীতি দ্বারা নির্যাতিত। সহজ ইচ্ছাপূরণ নয়, নাট্যক শর্ত মেনেই মনোজ মিত্র দেখিয়েছেন সেই মানুষের ঘুরে দাঁড়ানো। এই ঘুরে দাঁড়ানোর মধ্যে কোনো রাজনৈতিক তত্ত্ব নেই, আরোপিত আদর্শবাদ নেই- আছে মানুষের জন্য মানুষের আন্তরিক ভালোবাসা আর সহমর্মিতা। কোনো বক্তব্য চাপিয়ে দেওয়া নয়, পাঠক-দর্শকের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা নয়, এ যেন শুধু

নিজের অভিজ্ঞতাকে সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া। বিশিষ্ট সমালোচক শৈবাল মিত্র মনোজ মিত্রের নাটকের মূল সুরটিকে চিহ্নিত করেছেন যে; দেশ, কাল, ইতিহাস, সমাজ, ব্যক্তির সঙ্কট, অসহায়তায় তিনি অবিরত আলোড়িত, ব্যথিত হয়েছেন। জীবন কেন এত দুঃখময়, মানবিক সম্পর্কগুলো কেন ভেঙ্গে পড়ছে, কোথায় চলেছে মানবসভ্যতা, অস্তিত্বে বিজড়িত এই মৌলিক প্রশ্নগুলি বাঙালি দর্শক ও পাঠকদের তিনি ভুলতে দেন নি। সমগ্র নাট্যজীবনে মনোজ মিত্র চেষ্টা করেছেন ভেঙে যাওয়া মূল্যবোধের রক্ষণ ও লালনের।

মানুষের ক্ষুধা, অস্তিত্বের সঙ্গট, লোভ, বেঁচে থাকার প্রবল বাসনা, স্বার্থপরতা, সহমর্মিতা নিয়েই মনোজ মিত্রের নাটক। নিজের কালের সামাজিক-রাজনৈতিক অভিশাপ ও ব্যভিচারের নির্মোহ ব্যবচ্ছেদ করেছেন তিনি। কিন্তু সে ব্যবচ্ছেদ করেছেন কৌতুকের আশ্রয়ে, আর সে কৌতুক অনেক সময়ই চোখের জলের কাছাকাছি। আর এই কৌতুকের উপাদান রয়েছে নাট্যকারের নিজেরই চরিত্রে। দীনবন্ধু মিত্রের নাটক সমালোচনা প্রসঙ্গে বঙ্গিমচন্দ্রে দেশীয় ব্যঙ্গপ্রণালীকে দুভাগে ভাগ করে বলেছিলেন- 'রসিক লাঠিয়ালের মোটা লাঠির বাড়ি' এবং 'ডাক্তারের সরু লানসেটের সূক্ষ্ম আঘাত'। আর একালের সমালোচক এবং পাঠকরা মনোজ মিত্রের নাটকে এই দুইয়ের উপস্থিতিই লক্ষ্য করে থাকেন।

আধুনিক যুগে সামাজিক নাট্যকারকে কেবল সামাজিক উপকরণ সম্পর্কে অভিজ্ঞ হলেই চলবে না, মানবচরিত্র সম্পর্কে সূক্ষ্ম অন্তদৃষ্টির অধিকারীও হতে হয়:

> "ব্যাপক সামাজিক অভিজ্ঞতার উপর মানব-চরিত্রের জটিল রহস্য সম্পর্কে সুগভীর অন্তসৃষ্টি ও ব্যক্তিচরিত্র সম্পর্কে আন্তরিক সহানুভূতি না থাকিলে সামাজিক নাটক রচনায় কেহ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন না।"[৫]

এই জাতীয় নাট্যকারদের মধ্যে অন্যতম একজন হলেন নাট্যকার মনোজ মিত্র। তাঁর সামাজিক নাটক বিশেষ সামাজিক পরিস্থিতিতে ব্যক্তি-মানুষের সুখ-দুঃখ, লড়াই-যন্ত্রণা, আশা-আনন্দের প্রতিফলন। বৃহত্তর অর্থে মনোজ মিত্রের সব নাটকই সামাজিক। তাঁর সামাজিক নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- 'চাক ভাঙা মধু' (১৯৬৯), 'সাজানো বাগান' (১৯৭৬-৭৭), 'রাজদর্শন' (১৯৮১), 'নৈশভোজা' (১৯৮৪-৮৫) ইত্যাদি।

সমকালীন সাধারণ শোষিত মানুষের জীবনযন্ত্রণা, সংগ্রাম, অস্তিত্বসঙ্কট, বাদ-প্রতিবাদের চিত্র মনোজ মিত্রের নানা নাটকের বিষয় হয়ে উঠেছিল। পাশাপাশি নাটকের চরিত্ররাও জীবন্ত হয়ে উঠেছিল তাদের সংলাপের মাধ্যমে। মনোজ মিত্রের এমনই এক সামাজিক নাটক 'চাক ভাঙা মধু' (১৯৬৯)। এই নাটকে শোষক-শোষিতের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব, সমাজভাবনা, গণসংগ্রামকে তুলে ধরা হয়েছে। সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা ও শ্রেণী-সংগ্রামের ইতিহাস মনোজ মিত্রের 'চাক ভাঙা মধু' নাটকের মূল উপজীব্য বিষয়। মাতলা, জটা, শঙ্কর, অঘোর ঘোষ, ফুকনা, দাক্ষায়ণী এবং বাদামী- চরিত্রের সন্নিবেশে সম্পূর্ণ নাটকের কলেবর নির্মিত হয়েছে।

'চাক ভাঙা মধু'-তে অঘোর ঘোষ হল শোষক মহাজন। সে গ্রামের জমিদার এবং নিম্নশ্রেণীর মানুষদের উপর শাসন ও শোষণ করে অর্থের পাহাড় গড়ে তুলেছে। সাধারণ মানুষের রক্ত চুষে তিনি ক্রমশ বিত্তশালী হয়ে উঠেছেন। তার শাসনে ও শোষণে প্রজারা জর্জরিত ও দিশেহারা। গ্রামের মানুষেরা সকলেই তার প্রতি ক্ষিপ্ত।

বিংশ শতাব্দীর ছয়ের এবং সাতের দশকে বাংলার সমাজব্যবস্থার বিশৃঙ্খলার চূড়ান্ত নিদর্শন আলোচ্য নাটকে নাট্যকার মনোজ মিত্র দক্ষতার সাথে তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তিনি এই নাটকের প্রতিটি চরিত্রের নির্মাণ করেছেন। এই চরিত্রগুলির মধ্যে দুটি অন্যতম চরিত্র হল এক দরিদ্র ওঝা

মাতলা এবং তার একমাত্র মেয়ে বাদামী। মাতলার চেহারায় ও বেশভূষায় দারিদ্র্যের ছাপ স্পষ্ট ধরা পড়ে। ঢ্যাঙা, খড়ি-ওড়া বুকপিঠ এবং অর্ধনগ্ন, চুপসানো পেট, রুক্ষ ঝাঁকড়া চুল এবং ভাঙাচোরা মুখ নিয়ে মাতলা মাঝারি আকারের কলসি মাথায় করে বাড়ি ফেরে। তার কোমরে জড়ানো জালবোনা থলি ও হাতে একটা ছোট সড়কি। বাদামী ভাবে মাতলা হয়তো খাবারের সন্ধানে গিয়েছিল। কিন্তু মাওলা কোনো খাবার না নিয়ে বাড়িতে আসায় ক্ষুধার্ত বাদামী প্রচন্ড আক্ষেপকরে। বাদামী বিবাহিতা, গর্ভবর্তী ও স্বামী পরিত্যক্তা। অন্যদিকে সে মাতলার সংসারে একটা বোঝা। ক্ষুধার্ত বাদামী তার পিতা মাতলার আনা কলসি দেখে আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করলে মাতলা তাকে জানায়। "মধু, মধুরে বাদাম! হাঁ, হাঁ মধু, মৌ। জিবে ঠ্যাকাবি তো জিবখানা এমনি (হাত কাঁপায়) করতি লাগবে পুরো সাতদিন।"[৬]

একথা শুনে ক্ষুধার্ত বাদামী মধু খাওয়ার জন্য লালায়িত হয়। বাদামী আশা করে কলসির মুখ খোলে। আর কলসির মুখ খুলতেই বাদামী দেখতে পায় তার মধ্যে রয়েছে এক বিষধর গোখরো সাপ। মাতলার কাকা জটা নিমেষে কলসির মুখ চেপে ধরে। আর বাদামী তীব্র আক্রোশে ফেটে পড়ে ক্ষুধার যন্ত্রণায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জটার স্ত্রী একটানা সাতদিন না খেতে পেয়ে শেষে গঙ্গার জলে আত্মহত্যা করেছিল।

নাট্যকার মনোজ মিত্র এই নাটকে তৎকালীন বিশৃঙ্খল সমাজব্যবস্থাকে খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। ভয়ানক দারিদ্র্যতা কিভাবে সাধারণ মানুষের জীবনকে গ্রাস করেছিল, সাধারণ মানুষের জীবন এবং পরিস্থিতি কত করুণ ছিল, তা আলোচ্য নাটকে সুপ্রকাশিত হয়েছে। অভাবের তাড়নায় মাতলা বাদামীর আসন্ন সন্তানকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগেই মেরে ফেলতে চায়। ক্ষুধায় কাতর বাদামী সাপটিকে পুড়িয়ে খেতেও ইচ্ছুক। কিন্তু মাতলা তখন বলে। "না। ওটারে আমি পোষ মানাব। হা পোষ। বিষ দাঁত ছোটাবো না। গায়ে পা চাপায়ে উয়ার আমি জাজ বাড়াব।"[৭]

সমকালীন সমাজব্যবস্থা তথা জোতদার ও জমিদারদের শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে এখানে তীব্র রাগ-ক্ষোভ-বিদ্বেষ প্রকাশিত হয়েছে। শ্রেণীশাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে মাতলার ক্ষোভের তীর প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে তৎকালীন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতে এই নাটকে উঠে এসেছে। মহাজন অঘোর ঘোষ ভিটে-মাটি বন্ধক রেখে টাকা ধার দেয়। অঘোর ঘোষ মাতলার সর্বস্ব গ্রাস করেছে। তাই এবারে সে প্রতিশোধ নিতে চায়। মাতলা জমিদার অঘোর ঘোষ সম্পর্কে বলে, সে এসে লাল খাতা বের করে সুদ চাইবে, আর না দিতে পারলে: "পেছনে দুই লাথি মেরে ধারে কাছে যা পাবে সব ফর্সা করে নে যাবে।"[৮] তাই সুদ দেবার ভয়ে মাতলা, জটা এরা সকলে পালিয়ে বেড়ায় এবং জমিদার থেকে বদলা নিতে চায়।

একসময় একটা 'কালাচ' সাপ এসে অঘোর ঘোষকে ছোবল মারে। অঘোর ঘোষ যদি মারা যায় তাহলে গ্রামের হিন্দু-মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের মানুষ আনন্দিত হবে। কারণ প্রত্যেকেই তার শাসন ও শোষণে ক্ষুব্ধ। তাই অঘোর ঘোষের মৃত্যু হলে সকলেরই মুক্তি মিলবে। সকলের মতো মাতলাও চায়না অঘোর ঘোষ বাঁচুক। কিন্তু নাটকের অন্যতম প্রতিবাদী তথা দরদী চরিত্র মাতলার মেয়ে বাদামী। সে তার আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয় না। মাতলা অঘোর ঘোষকে বাড়াতে না চাইলেও বাদামী দৃপ্ত কণ্ঠে বলে ওঠে। "বাপ! এটা মানুষ মরে যায়, আর তোমরা নাচতি লেগেছ। জানো না, ওঝার কানে খবর গেলি ছুটে যেতে হয় রুগীর ঠীয়।"[৯] অন্যদিকে অঘোর ঘোষকে বাঁচাতে উদগ্রীব তার আশ্রিতা বিধবা বোন দাক্ষায়ণী ঠাকরুণ এবং ছেলে শঙ্কর। এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে মাতলা এবং জটা দাক্ষায়ণীর কাছ থেকে টাকা আদায় করতে চায়। এহেন পরিস্থিতির বর্ণনা সেই সময়ের সমাজ ব্যবস্থার পরিচায়ক। কিন্তু নাট্যকার মনোজ মিত্র তাঁর এই 'চাক ভাঙা মধু' নাটকে বাদামী চরিত্রকে বিশিষ্টতা দান করেছেন। বা দামী একজন মানুষ হিসেবে এবং তার নৈতিক

দায়িত্ব পালনের দিক থেকে অঘোর ঘোষকে বাঁচাতে চেয়েছে। তাই সে শঙ্করকে বলে অঘোর ঘোষকে তাদের বাড়িতে নিয়ে আসতে। বাদামী মাতলা ও জটার কার্যকলাপে বিরক্ত হয়ে কঠোরভাবে বলে উঠে: "ভেবেছ কী, তোমরা ছাড়া আর কেউ নেই তারে বাঁচানোর? ভেবেছ কি তোমরা, জানিনে ঝাড়ন? চিনিনে ওষুধ?"[১০] চাষী ফুকনা এবং গ্রামের হিন্দু-মুসলমান সবাই অঘোর ঘোষের পরিপন্থী। কিন্তু মানবতাবাদী বাদামীর নৈতিকতায় গ্রামবাসীদের মনও পরিবর্তিত হয় এবং শেষে মাতলাও অঘোর ঘোষকে ঝাড়াতে রাজী হয় এবং সে বলে: "রুগীর আবার জাত দ্যাখে নাকি বদ্যি? সরল! সরল না তো কি জটিল! ঝাড়াব!"[১১]

তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর মানুষ বলে একপ্রকার অহংকার ছিল অঘোর ঘোষদের। দাক্ষায়ণী শেষে নতিস্বীকার করে বলে: "শেষ পর্যন্ত তোদের দোরে এসেই দাঁড়াতে হল রে।"[১২]

মনোজ মিত্রের 'চাক ভাঙা মধু' নাটকের শেষ অংশেই হল মূল আকর্ষণ। মাতলা যখন অঘোর ঘোষকে ঝাড়াতে শুরু করে তখন বাদামী অনুভব করে চতুর্দিকে যেন প্রাণ লাফাতে আরম্ভ করেছে। মাতলার মন্ত্রের শক্তিতে হাত-পা ছেড়ে আছড়ে হামাগুড়ি দিয়ে অঘোর ঘোষ চিৎকার করে বলে ওঠে:

> "আমি কখনো জ্ঞান হারাই নি! যতো চেঁচাই, ডাক বেরোয় না। (দাক্ষাকে) অত জোরে বাঁধলি কেন? এত হাত-পা আছড়াই, বুঝিসনি কেন?"[১৩]

দাম্ভিক, অত্যাচারী অঘোর ঘোষ দেনার দায়ে মাতলার উপর দুর্বিষহ অত্যাচার করা সত্ত্বেও বাদামী এবং মাতলা অঘোর ঘোষকে ক্ষমার চোখে দেখেছে এবং তার প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছে। মনোজ মিত্রের চরিত্র সৃষ্টির কৃতিত্ব এখানেই। কিন্তু অঘোর ঘোষের চরিত্রের একটুকু বদল হয়নি। পুনরায় গর্জে উঠে সে লোভের থাবা বসায় বাদামীর দিকে। কামাতুর হয়ে সে বাদামীকে নিজের ঘরে নিয়ে যেতে চায়। আর দাক্ষায়ণীকে সে হেনস্থা আর অপমান করে। মনোজ মিত্রের লেখনীতে নাটকে এহেন সমাজের কুৎসিত চেহারা প্রকট হয়ে ওঠে। অঘোর ঘোষের এই অকৃতজ্ঞতা এবং দম্ভের প্রতিশোধ নিতে বাদামী সমাজের শোষিত, বঞ্চিত, অত্যাচারিত শ্রেণীর প্রতীক ও প্রতিনিধিরূপে শাসক ও অত্যাচারী জমিদার অঘোর ঘোষকে কচ্ছপ ধরার সড়কি দিয়ে হত্যা করে। বাদামীর এই প্রতিশোধ বা প্রতিবাদ কেবলমাত্র অঘোর ঘোষের বিরুদ্ধে নয়, সমাজের নিম্নশ্রেণীর সাধারণ মানুষদের উপর সমাজের উচ্চশ্রেণীর অত্যাচারী মানুষদের বিরুদ্ধে। এই জমিদার শ্রেণীই শাসনের নামে শোষণ, বঞ্চনা ও অত্যাচারের মাধ্যমে বাদামী, মাতলা, জটাদের মতো সহজ-সরল মানুষদের যুগ যুগ ধরে পদদলিত করে রাখে। নাট্যকার মনোজ মিত্র তাঁর এই 'চাক ভাঙা মধু' নাটকে তৎকালীন সমাজব্যবস্থার ও আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির বাস্তব চিত্র খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করেছেন।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এই যে, মনোজ মিত্রের নাটকগুলোর মধ্যে তাঁর দরদী মনের চিত্র ফুটে উঠেছে। অসহায়, দুর্বল, প্রান্তিক মানুষের জন্য তাঁর দরদ এবং সহানুভূতি প্রায় প্রতিটি নাটকেই লভ্য। তাঁর নায়কেরা প্রায় সকলেই জীবনের নিম্নস্তরের মানুষ, তারা সমাজের বিশিষ্ট কেউ নয়- তাঁদের জন্যই মনোজ মিত্রের দরদ এবং সহানুভূতি। তাই মনোজ মিত্রের নাটকের প্রতি রসবোধ এবং সাধারণ মানুষের প্রতি দরদের দিকটিকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন মনোজ মিত্রের বন্ধু শ্রী অশোক মুখোপাধ্যায়:

> "তার রসবোধ তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনার মধ্যেও খুঁজে পায় মজার এবং উপভোগের অফুরন্ত উপাদান। যে কোনও মানুষের মধ্যে, যে কোনও ঘটনার মধ্যে, যে কোনও অভিজ্ঞতার মধ্যে এত যে রঙ্গের সম্ভাবনা ছিল, মনোজের সঙ্গে না থাকলে তা বোধ হয় ধরাই পড়ত না। কিন্তু শুধুমাত্র রঙ্গ নয়, খুব কাছের থেকে দেখলে ধরা পড়বে, মানুষের জন্য গভীর মমতা ও ভালবাসায় ভরে আছে মনোজের ভেতরটা।"[১৪]

তথ্যসূত্র:

১. চট্টোপাধ্যায়, কুন্তল। সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ। রত্নাবলী, কলকাতা, পঞ্চম পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ: ভাদ্র-১৪২১, পৃ. ১৫১।

২. Ibsen, Henric. The Types of Drama: Problem Play-The Anatomy of Drama. Kalyani Publishers, New Delhi, June-1999, Page No. 149-150.

৩. মিত্র, মনোজ ও মিত্র, অমর। ভাসিয়ে দিয়েছি কপোতাক্ষের জলে। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি-২০১১।

৪. মিত্র, মনোজ। মনের কথা নাট্যকথা। আজকাল, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: মাঘ-১৪১৩।

৫. ভট্টাচার্য, শ্রীআশুতোষ। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)। এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ-১৯৬১।

৬. মিত্র, মনোজ। শ্রেষ্ঠ নাটক একাদশ। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: বৈশাখ-১৪২৬।

৭. তদেব, পৃ. ৩৩৪।

৮. তদেব, পৃ. ৩৩৪।

৯. তদেব, পৃ. ৩৩৬-৩৩৭।

১০. তদেব, পৃ. ৩৪১।

১১. তদেব, পৃ. ৩৪১।

১২. তদেব, পৃ. ৩৪১।

১৩. তদেব, পৃ. ৩৭১।

১৪. মুখোপাধ্যায়, অশোক। মতান্তরকে শ্রদ্ধা করে, মনান্তর ঘটতে দেয় না। আজকাল, কলকাতা, আগস্ট-১৯৯২।